২৬

আজকের কাগজ

তারিখ ... 2.2.APR 1995... ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩...

বিপর্যস্ত শিক্ষা ব্যবস্থা

বিনোদ দাশগুপ্ত

আমাদের দেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে আজ যে সার্বিক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তাকে এক কথায় শুধু হতাশা ব্যঞ্জক নয়, বলা যায় অত্যন্ত ভয়াবহ। এই অবস্থায় শিক্ষার্থীরা এবং তাদের অভিভাবকরা সম্পূর্ণ দিশেহারা। বিশেষত উচ্চ শিক্ষাঙ্গনগুলোতে লেখাপড়ার পরিবেশ বলতে আর কিছুই যেন অবশিষ্ট নেই। দেশের লক্ষ লক্ষ ছেলে মেয়েদের একদিকে উচ্চতর কোন ডিগ্রী লাভের চেষ্টা করা ছাড়া বেঁচে থাকার বিকল্প সুযোগ সম্ভাবনা প্রায় নেই। অন্যদিকে উচ্চতর শিক্ষায়তনে শিক্ষা লাভের সকল সুযোগ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন। তাছাড়া ভাগ্যবান কিছু সংখ্যক যারা অকল্পনীয় কষ্ট স্বীকার ও জীবনের ঝুঁকির বিনিময়ে ৩/৪ বছরের স্বাভাবিক শিক্ষা জীবন কোন রকমে ৮/৯ বছরে হলেও শেষ করার মত ধৈর্য ও সাহস দেখান তখন তাদের জন্যে আবার কর্মসংস্থানের কোন সুযোগ খোলা থাকে না। সর্বোপরি দীর্ঘ প্রাণান্তকর এই সাধনার মধ্যেও তাদের মূল্যবান জীবনটি কোন দিন শিক্ষাঙ্গনে স্থায়ীভাবে আসন গেরে বসা সন্ত্রাসীদের আগ্নেয়াস্ত্রের মুখে ঝরে যাবে সে কথা কেউ জানে না।

এই হচ্ছে আজ বাংলাদেশের উচ্চতর শিক্ষাঙ্গন বলে পরিচিত প্রতিষ্ঠানগুলোর অভ্যন্তরিণ অবস্থা। তার মানে কিন্তু আবার এই নয় যে নিম্ন পর্যায়ের শিক্ষাঙ্গনগুলোর অবস্থা অত্যন্ত আশাপ্রদ বা সুখকর। সেখানকার সামগ্রিক শিক্ষা পরিস্থিতিও সুষ্ঠু বা স্বাভাবিক নয়। তাছাড়া সরকারি প্রতিক্রিয়াশীল শিক্ষা নীতির কারণে এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেশ প্রেম, মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ববোধ বা মানবতাবাদী চেতনা জাগ্রত করার কোন ব্যবস্থা নেই। এমন কি এ দেশের স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতা যোদ্ধাদের ইতিহাস শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থাও এই শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। ফলে এখান থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেশ ও দেশের মানুষের প্রতি কোন দায়িত্ব বোধের ঠিকানা ঘটানো হচ্ছে না। ছাত্র সমাজের মধ্যে কোন বিজ্ঞানমনস্কতা, যুক্তিবাদ বা আধুনিকতাবোধ সৃষ্টিরও ব্যবস্থা নেই বর্তমানের এই শিক্ষায়। স্বভাবতই এখান থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের অতি ক্ষুদ্র অংশকে অন্তত উচ্চতর শিক্ষাঙ্গনে যাওয়ার পর নানা পন্থায় সন্ত্রাসের প্রতি প্রলুব্ধ করা সম্ভব হচ্ছে। তদুপরি সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতা, হাই জ্যাকিং ইত্যাদি নানা অপরাধী চক্রের মধ্যেও এদের একটি অংশকে টেনে নেয়া হচ্ছে। এই অবস্থায় বিরাট সংখ্যক অভিভাবক নিজেদের সন্তানদেরকে দেশের অভ্যন্তরে শিক্ষা দেয়ার পরিবর্তে উচ্চ শিক্ষার জন্যে বাইরের যে কোন দেশে পাঠিয়ে দেয়ার জন্যে সদা ব্যতিব্যস্ত। সত্যি কথা অতি সামান্য সংখ্যক অভিভাবকই এই চেষ্টায় সফল হতে পারছেন। কিন্তু এর পরেও বিদেশে অধ্যায়নরত (উচ্চতর শিক্ষায়তনে) ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা আজ দেশের জন সংখ্যা ও আয়তনের তুলনায় বিশেষত এ দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত ব্যাপক। অথচ অশেষ ক্লেশ স্বীকার করে হলেও অভিভাবক এবং শিক্ষার্থীদের পক্ষে বিদেশে পাড়ি জমাবার সর্বাত্মক চেষ্টা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

আজ এ লেখায় যখন হাত দিয়েছি তখন সর্বাগ্রে একটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত প্রথম পৃষ্ঠার একটি বড় আকারের শিরোনামের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। এতে বলা হয়েছে, 'কাল অনার্সে ভর্তি পরীক্ষা শুরু' ঢাকা ভার্সিটি বিজ্ঞান অনুষদে ১১৫০ সিটে ২১০০০ পরীক্ষার্থী। এই খবরের মধ্যে সংবাদপত্রটির বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার লিখেছেন আগামীকাল শুক্রবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৯৪-৯৫ শিক্ষা বছরের অনার্স প্রথম বর্ষ 'ক' ইউনিটের ('বিজ্ঞান ও জীব বিজ্ঞান' অনুষদ) ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। সকাল দশটা থেকে ১২টা পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ রাজধানীর বিভিন্ন কলেজে মোট ২৩টি কেন্দ্রে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। সবচেয়ে প্রতিযোগিতাপূর্ণ এই ইউনিটের ১১৫০টি সিটের জন্যে মোট ২১ হাজার ৩ শত ১৯ জন পরীক্ষার্থী অংশ নেবেন।

অন্যদিকে আগামী ১৫ এপ্রিল 'গ' ইউনিটের (বাণিজ্য অনুষদ) ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এই ইউনিটে ৬৪০টি আসনের বিপরীতে ১০ হাজার ৭ শত ৩৯ জন পরীক্ষার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। এদিকে কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ 'খ' ইউনিটের পরীক্ষা ২১ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হবে। এ ইউনিটে সিট সংখ্যা ১৫০০ শত, পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১৭ হাজার ৩০ জন।

ইতোপূর্বে অন্য একটি সংবাদপত্রের ২০ মার্চের এক খবরে বলা হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স কোর্সে ভর্তি পরীক্ষায় এবার ১টি আসনের জন্যে লড়াই করবে ১৭ জন। সব ক'টি ইউনিট মিলে এবারের মোট আসন সংখ্যা এখানে নাকি (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) ৩ হাজার ৭ শত ৮৭টি। এই সব আসনের জন্যে আবেদন জমা পড়েছে ৬৩ হাজার ৩ শত ১৩টি। এই আবেদনপত্র জমা দেয়ার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়ও মোটামুটি কম হয়নি বলে জানা যায়। এখাতে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৭৯ লাখ ১৪ হাজার ১২৫ টাকা।

একটা জিনিস সুস্পষ্ট যে ভর্তি হতে ইচ্ছুক আবেদনকারীর সংখ্যা প্রতি বছরই প্রায় ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। নীচের সংখ্যাতত্ত্ব থেকে এটা পরিষ্কার বোঝা যাবে। ১৯৯৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদে ভর্তির জন্যে ফর্ম জমা পড়েছিল ৪৬ হাজার ৯'শ ৬৪টি। ১৯৯৪ সালে এই সংখ্যা ছিল ৫২ হাজারের বেশি। কিন্তু এ বছর অর্থাৎ ৯৫ সালে সংখ্যাটি হঠাৎ অনেক বেড়ে গেছে। এই সংখ্যাতত্ত্বকে কেবল শিক্ষার্থীদের উচ্চতর শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বেড়ে যাওয়ার প্রমাণ হিসাবে মনে করলে ভুল হবে। বরং এটাকে একটি বাধ্যতামূলক পরিস্থিতি বলে ধরে নিতে হবে। আমরা এ লেখার শুরুতেই প্রায় বলেছিলাম দেশের পরিস্থিতি আজ এমন এক অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যে ছাত্র ও তাদের অভিভাবককের এক দিকে উচ্চ শিক্ষালয়গুলোর দারস্থ হওয়ার জন্যে চেষ্টা না করে উপায় নেই। অন্যদিকে সেখানে লেখাপড়ার ন্যূনতম সুস্থ কোন পরিবেশেও গুরুতর অভাব। এ এক চরম অসহায়ত্বমূলক অবস্থা। যারা বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্য শিক্ষায়তনগুলোতে ভর্তি হওয়ার চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হবেন তাদের সংখ্যা যে অত্যন্ত বিপুল তাতে কোন সন্দেহ নেই। এদের মধ্যে বিরাট অংশই হবেন প্রথম বিভাগপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রী। সংগত কারণে এদের অনেকেই ভাল কোন কলেজে ভর্তি হতে পারবেন না সম্ভবত। আর বিদেশে যাওয়ার সৌভাগ্যই বা কয়জনের হতে পারে?

এরপরও কিন্তু ছাত্র-ছাত্রী এবং তাদের অভিভাবকরা বিদেশ যাওয়ার চেষ্টায় অনেকটা মরিয়া এবং যারা বাইরে যে কোন দেশে কোন না কোন একটি অখ্যাত প্রতিষ্ঠানেও আসন লাভ করতে পারছেন তারা নিজেদেরকে অত্যন্ত ভাগ্যবান বলেই বিবেচনা করেন। আগের দিনে নিজের খরচে অন্তত পড়াশোনার জন্যে পশ্চিমা অনেক দেশে যাওয়া খুব কঠিন ছিল না। কিন্তু ইদানিং সে সব দেশে নিজের খরচে পড়তে যাওয়ার ব্যবস্থাও বিভিন্ন কারণে প্রায় দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। ব্যয় বহুলতা ছাড়াও এসব অনেক দেশে আরোপিত অন্যান্য অনেক কড়াকড়ির কারণে পড়াশোনা করতে যাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠছে ক্রমশ। এই কড়াকড়ি আরোপের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র এখন প্রায় শীর্ষে। কিন্তু এত সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশী ছাত্রের সংখ্যা নাকি ক্রমেই বেড়ে চলেছে। মার্চ মাসের মাঝামাঝির দিকে প্রকাশিত সাম্প্রতিককালের একটি ইউসিস এর সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই খবর জানা যায়। এতে বলা হয়েছে বিদেশি ছাত্র-ছাত্রীদের সম্পর্কে ইন্সটিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশন (আই আই ই) পরিচালিত এক জরিপে দেখা গেছে যে যুক্তরাষ্ট্রের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অধ্যায়নরত বাংলাদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা পুনরায় বৃদ্ধি পেয়েছে। রিপোর্ট অন ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশনাল একচেঞ্জ এর সর্বশেষ বার্ষিক সংখ্যায় উল্লেখিত পরিসংখ্যানে বলা হয় আমেরিকান কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ১৯৯৩-৯৪ সালে ৩,২৩৬ জন বাংলাদেশী ছাত্র ছাত্রীকে ভর্তি করা হয়। এর মধ্যে ৬০ শতাংশ আন্ডার গ্রাজুয়েট ক্লাসে .৩ ৩৭ শতাংশ গ্রাজুয়েট ক্লাসে এবং ২.৭ শতাংশ অন্যান্য ক্লাসে অধ্যায়ন করছে। ১৯৯২-৯৩ সালে ২,৯৩৩ জন বাংলাদেশী ছাত্র-ছাত্রীর তুলনায় এই সংখ্যা শতকরা ১০.৩ শতাংশ বেশি। অথচ উক্ত সময়ে যুক্তরাষ্ট্রে অধ্যায়নরত পাকিস্তান ও ভারতের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা নাকি যথাক্রমে ৯ শতাংশ এবং ৩.২ শতাংশ হারে হ্রাস পেয়েছে। এর মধ্য দিয়েই প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের বাইরে পড়তে যাওয়ার প্রাণান্তকর সাধনার কথাই প্রকাশ পায়।

কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে অধ্যয়নরত বাংলাদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা দিয়ে এই অবস্থার গুরুত্ব তেমন বোঝা যাবে না। এদেশের সর্বাধিক ছাত্র-ছাত্রী এখন সম্ভবত ভারতের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত। এই সংখ্যা অন্যূন ৬০ থেকে ৭০ হাজার হবে বলে অনেকের ধারণা। কিন্তু কোন অবস্থাতেই এই সংখ্যা যে ৫০ হাজারের বেশি ছাড়া কম হবে না তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর অতি ক্ষুদ্র মাত্র একটি অংশই যে সেখানকার রাষ্ট্রীয় স্কলারশীপ পেয়ে সেখানে পড়তে গেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। অন্তত ৯০ শতাংশ পড়তে গেছে নিজ খরচে। এবং এ দেশের শিক্ষা পরিবেশই যে তাদেরকে এ কাজ করতে বাধ্য করেছে তা আর ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই। ছাত্র-ছাত্রী ও তাদের অভিভাবকদের বৃহত্তর অংশই যারা নিজেদের চেষ্টায় সফল হয়েছেন তারা যেন শ্বাস ছেড়ে বাঁচছেন। তারা বোধ হয় বিশ্বাস করেন 'যে পলায়তে স জীবতি'। অর্থাৎ দেশের শিক্ষাঙ্গনের বদলে বিদেশের যে কোন শিক্ষাঙ্গনে যেতে পারলেই বাঁচা গেল। তাদের এই ভাবনার পেছনে অনেক যুক্তি আছে। প্রথম ও প্রধান যুক্তি হল বিদেশের কোন শিক্ষালয়ে যানজটের মত সেশনজট নেই। সেখানে কোথাও ৪ বছরের শিক্ষা জীবন প্রায় ৮ বছরে সম্পন্ন করতে হয় না। যথা সময়েই তা শেষ হয়ে যায়। ফলে কাঙ্ক্ষিত ডিগ্রী লাভের জন্যে ছাত্রদের মূল্যবান জীবনের কম পক্ষে তিন চারটি বছর অযথা হারিয়ে যায় না। এতে অভিভাবকরা আর্থিক বোঝার দিক থেকেও অনেক খানি লাভবান হন। তদুপরি কাঙ্ক্ষিত শিক্ষা জীবন সমাপ্ত করতে করতে ছাত্রদের সরকারি চাকরি প্রাপ্তির বয়স সীমাও অতিক্রান্ত হয়ে যায় না ওখানে। এখানে অতিক্রান্ত বয়সসীমায় শিক্ষা সমাপ্তির ফলে শিক্ষার্থীদের অনেকের বেকারত্ব আরো নিশ্চিত হয়ে ওঠে। অর্থাৎ লেখা পড়াটাই শেষ পর্যন্ত তাদের কাছে অনেকটা অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। এমনিতেই বাংলাদেশে এখন কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রায় শূন্যের কোঠায় এসে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। এর উপর চাকরির বয়স সীমা পার হয়ে গেলে সে জন্যে চেষ্টা করার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হন তারা। এ কারণে দেশের কোন মহল চান বা না চান এ দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের লক্ষ্যে বিদেশে পাড়ি জমাবার চেষ্টা যে দিনের পর দিন আরো বেড়ে যাবে সে কথা প্রায় নিশ্চিত করে বলা যায়। এর ফলে অন্যান্য অনেক প্রতিক্রিয়া ছাড়াও এই শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেশ প্রেম বা দেশ জনগণের প্রতি তাদের দায়িত্ব বোধ আরো হ্রাস পাচ্ছে দিনের পর দিন।

এই তো গেল আমাদের শিক্ষাঙ্গনের একটি দিকের চিত্র মাত্র। এছাড়াও এই শিক্ষাঙ্গনে আরো ভয়াবহ ধরনের পরিস্থিতি বিরাজমান। অন্য কথায় এই শিক্ষাঙ্গনই যেন দেশে বর্তমানে সব চেয়ে ভীতিকর স্থানে রূপান্তরিত হয়েছে। সে সম্পর্কেই আমরা এখন একটু আলোচনা করবো। দেশের উচ্চতর শিক্ষালয় বিশেষত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সন্ত্রাসের উন্মুক্ত ময়দানে পরিণত হয়েছে। প্রায় প্রতিটা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিগত বছরগুলোতে যে অগণিত সংখ্যক তরুণ তাজা শিক্ষার্থীর প্রাণ অকালে ঝরে পড়েছে তার পরিপূর্ণ হিসাব দেখলে যে কোন দেশের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের বিবেক বুদ্ধি লোপ পাওয়ার কথা। কিন্তু এমন এক দুঃসহ করুণ পরিস্থিতির মধ্যেও এদেশের শত শত সন্তান হারা মা